সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫২, সংখ্যা : ৩ ॥ আষাঢ় ১৪২২ ॥ জুন ২০১৫

নারীবাদ প্রসঙ্গ

রাজিয়া খানম লাকি*

নারীর প্রতি বৈষম্য এবং পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলো নারীবাদ। নারীবাদ সমঅধিকার দাবি করে। ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রচলিত সমাজ-কাঠামো নারীর সমঅধিকার দাবির ক্ষেত্রে একটি বাধাস্বরূপ। নারীবাদ জেন্ডার (সমাজকর্তৃক সৃষ্ট নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা বা নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য) ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা স্বীকার করতে চায় না। এ মতবাদ অনুযায়ী, নারী ও পুরুষের মধ্যে জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য আছে কিন্তু এ পার্থক্যকে পুঁজি করে পিতৃতন্ত্র নারীকে যে সমাজে অধস্তন করে রাখছে, নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করছে — তা নীতিসম্মত নয়। এ প্রবন্ধে নারীবাদ, প্লেটোর নারীবাদী চিন্তাধারা এবং নারী অধিকার সম্পর্কে মেরী উলস্টোনক্রাফটের মতাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে নারীবাদী ও সমাজসংস্কারক রোকেয়ার মতাদর্শও ব্যাখ্যা করা হবে।

নারীবাদ বা Feminism শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Femina-Woman শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো নারীসুলভ গুণের সমন্বয়। ১৮৯০ সালে 'Womanism' শব্দের পরিবর্তে 'Feminism' শব্দটির বিকাশ ঘটে। এলিস রোজি তাঁর *Feminism at a Millinium* (১৯৯৫) গ্রন্থে এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। (ফারজানা, ২০০৯ : ৬৭) অনেকে মনে করেন, উনিশ শতকে ফরাসি দার্শনিক Charles Fourier নারীবাদ শব্দটির সূচনা করেন।

'নারীবাদ' বিষয়টি সাম্প্রতিককালে বহুল আলোচিত হলেও খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-৪০০ বছর পূর্বে এ বিষয়ে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। (হামিদা, ২০০০ : ৭৮) প্রাচীন গ্রিক পিথাগোরীয় দর্শন ও প্লেটোর দর্শনে পুরুষের ন্যায় নারীর সমঅধিকার সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। পিথাগোরীয় সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সামাজিকভাবে সমান অধিকার স্বীকৃত ও কার্যকর ছিল। পিথাগোরীয় দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো ঐক্য ও সমন্বয়। নারীবাদী পিথাগোরীয়দের মাঝেও এ ধারণা বলবৎ ছিল। তাঁদের লিখিত কোনো কিছু সরাসরি না পাওয়া গেলেও অন্যদের আলোচনা থেকে সতের জন নারীবাদী পিথাগোরীয়দের কথা উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — মেলিসা (Melissa), মিয়া (Myia), পেরিকটোন (Periktone), ফিনটিস (Phintys), এসারা (Aesara) ও থিয়ানো (Theano)। পিথাগোরীয় নারীবাদী ফিনটিস মনে করেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের কাজের মধ্যে পার্থক্য (যেমন — নারীর কাজ হচ্ছে গৃহস্থালির, আর পুরুষের কাজ হচ্ছে বহির্জগতের) রয়েছে তবে নারীর গার্হস্থ্য কর্ম মর্যাদাকর ও সম্মানীয়। (রাশিদা, ২০০৫ : ১৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এসে যখন নারীর গৃহকর্মকে সম্মানের

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।

দৃষ্টিতে দেখা হয় না তখন ওই ঐ যুগে নারীর গৃহস্থালির কাজকে সম্মানের চোখে দেখার ঘটনাটি বিস্ময়কর।

পিথাগোরীয় সমাজকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আখ্যা দেওয়া যায়। এ সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়কে একই মানদণ্ডে বিচার করা হত। নারীর জন্য পৃথক কোনো মূল্যবোধ ছিল না। যার ফলে নারীর গৃহস্থালির কাজকর্ম পুরুষের বহির্মুখী কাজকর্মের মতোই সমান মর্যাদা পেত। তবে নারী-পুরুষের কাজের বিভাজন ছিল অর্থাৎ শ্রমের বিভাজন ছিল। তবে এ বিভাজনে উচ্চস্তর-নিম্নস্তর এ ভেদ ছিল না। পিথাগোরীয়রা নারীকে পুরুষের ন্যায় সম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করত। ন্যায়বোধ পিথাগোরীয় সমাজকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল।

নারীবাদ একটি প্রতিবাদ, নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মূলত একটি শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই নারীবাদের লক্ষ্য। বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। বাস্তবে সমতার নীতি পালন করা হয় না বরং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে (পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে) বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈষম্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে পিতৃতন্ত্র। নারীরা পিতৃতন্ত্রের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ফরাসি নারী পলেইন ডিলা ব্যারেকে বলেন, সমাজ কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরুষের একচ্ছত্র অবস্থান নারী শোষণকে একটি দুঃসহ অবস্থানে নিয়ে গেছে। (মোবারক, ২০০২ : ২৮)

আমরা জানি, নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এই পার্থক্যকে পুঁজি করে পুরুষতন্ত্র নারীকে শোষণ করে, নিপীড়ন করে ও অধস্তন করে রাখে। পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট নারীদের অধস্তন অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে সংগঠিত প্রয়াস তাকেই নারীবাদ বলা যায়। নারীবাদ হলো, পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর হীন মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন এবং এই অবস্থা পরিবর্তনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করে এবং নারী অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয় তারাই হলেন নারীবাদী। নারীবাদ একটি মতাদর্শ। নারীবাদ সম্পর্কে নিম্নে তিনটি সংজ্ঞার্থ উল্লেখ করা হলো।

রোজালিন্ড ডেলমার (Rosalind Delmar) নারীবাদের সংজ্ঞার্থ দিতে দিয়ে বলেন, নারীবাদ হচ্ছে 'সাধারণভাবে সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য সক্রিয় আগ্রহ।' (মাহমুদা, ২০০৮ : ৫৩) (Feminism is usually defined as an active disire to change women's position in society.) এখানে বুঝা যাচ্ছে যে, সমাজে নারী ও পুরুষ বৈষম্যমূলক অবস্থায় রয়েছে। যেমন — পুরুষ অফিস-আদালতে, কল-কারখানায় ও ব্যবস্থাপনায় অবস্থান করে; অপরদিকে অধিকাংশ নারী নিম্ন পদমর্যাদায় যেমন — সন্তান লালন-পালন, পরিবারের দেখাশুনা, গৃহ পরিচারিকা, সেবিকা প্রভৃতি কাজে অধিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা রয়েছে তার পরিবর্তনের জন্য নারী সক্রিয়ভাবে আগ্রহী।

ক্রিস্টিনা হফ সোমারস (Christina Hoff Sommers)-এর মতে, নারীবাদ হচ্ছে, 'নারীর জন্য উদ্বেগ এবং নারীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ প্রত্যক্ষ করার দৃঢ় সংকল্প।' (মাহমুদা, ২০০৮ : ৫৩) (A concern for women and a determination to see them fairly treated.) উক্ত সংজ্ঞার্থের আলোকে বলা যায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্যকে ভিত্তি করে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর ওপর নিপীড়নমূলক আচরণ করে — যা নারীর আত্মসম্মানে আঘাত হানে। নারীবাদ এই নিপীড়নমূলক আচরণের পরিবর্তে পুরুষের প্রতি যে আচরণ নারীর প্রতিও সেই আচরণ প্রত্যাশা করে।

কামলা বেসিন (Kamla Basin) ও নিগহাত সাইদ খান (Nighat Said Khan) বলেন, 'নারীবাদ হলো সমাজে, কর্মস্থলে ও পরিবারের অভ্যন্তরে নারী নিপীড়ন ও শোষণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং ঐ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নারী পুরুষের সজ্ঞান কর্মকাণ্ড' (মাহমুদা, ২০০৮ : ৫৩)। (An awareness of women's oppression and exploitation in society at work and within the family, and conscious action by women and men to change this situation) পরিবারে নারী স্বামী থেকে শুরু করে অন্যদের দ্বারা এবং কর্মস্থলেও বিভিন্নভাবে নিপীড়িত হয়। পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এক কথায় সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী নিপীড়িত ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এ সম্পর্কে অনেক নারীই সচেতন নয়। নারীবাদ এ বিষয়টিই স্পষ্ট করতে চায়।

সার্বিক বিচারে বলা যায় যে, নারীবাদ হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্দোলন যা একজন মানুষ হিসেবে নারীকে তার ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করার ওপর ইঙ্গিত প্রদান করে, কিন্তু পুরুষের অধিকারে কোনো বাধা প্রদান করে না।

নারীবাদের সঙ্গে মূলত নারীর অধিকার সম্পৃক্ত। নারী যে বহু ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তার পেছনে নারীবাদী কর্মীদের রয়েছে অপরিসীম অবদান। নারীর সঠিক ভূমিকা অন্বেষণ এবং নারীর আত্মপরিচয়ের পূর্ণ মূল্যায়নের মধ্যে নারীবাদীরা ভেঙেছেন পুরানো নির্মাণ আর অনুমাননির্ভর ভ্রান্ত ধারণা। বর্তমানে চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শের দিক থেকে নারীবাদ তাদের (নারীদের) অধস্তন অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষ পরস্পর মিলে মিশে কাজ করে সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সমাজ নারীর কর্মকে মূল্যায়ন করেনি।

নারী ও পুরুষের মধ্যে জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে পার্থক্য আছে। জৈবিক পার্থক্য নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু জৈবিক পার্থক্যের দোহাই দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের মধ্যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য (যেমন— পুরুষ যুক্তিবুদ্ধির অধিকারী, বীর, সাহসী, পরাক্রমশালী) আরোপ করে সেগুলোকে পুরুষসুলভ এবং নারীর মধ্যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য (যেমন— নারী দুর্বল, হীন, আবেগপ্রবণ, ভীরু, সিদ্ধান্ত নিতে অপরাগ) আরোপ করে সেগুলোকে নারীসুলভ আখ্যা দিয়েছে। অর্থাৎ জৈবিক পার্থক্যকে ভিত্তি করে সমাজ নারী ও

পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। সমাজ কর্তৃক নির্মিত এ পার্থক্য হলো জেন্ডার (পৌরুষ ও নারীত্ব) পার্থক্য।

এ আলোচনায় আমরা দেখছি যে, জৈবিক পার্থক্যকে পুঁজি করে সমাজ জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করেছে ও নারীকে অধস্তন করে রেখেছে। জেন্ডার পার্থক্য নারীর মানবিক অস্তিত্ব ও সত্তা অস্বীকার করে তাঁর মেধা, মনন ও বুদ্ধির বিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, মানবেতর জীবনে ঠেলে দিয়ে পুরুষের সেবাদাসীতে পরিণত করেছে। সর্বোপরি বিয়ের মাধ্যমে নারীর কর্তা সেজে নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, নিপীড়ন করেছে। এসবই করা হয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) (মাহমুদা, ২০০৮ : ৯)। এই পিতৃতন্ত্র নারী ও পুরুষের মধ্যেকার জেন্ডার বিভক্তি ও নারী নিপীড়নের অস্ত্রস্বরূপ।

পিতৃতন্ত্র এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, নিপীড়ন ও শোষণ চালায়। পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি হলো পুরুষ প্রাধান্য। সমাজের সর্বস্তরে পুরুষ প্রভুত্ব বিস্তার করে রেখেছে এবং নারীকে অধস্তন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করেছে। পিতৃতন্ত্র এমন শক্তিশালী যে নারী সকল নিপীড়ন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং সকল নিপীড়ন নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে। সমাজ, পরিবার ও সন্তানের কথা বিবেচনা করে প্রতিবাদ থেকে বিরত থেকেছে। নারীর এই মান্যতাকে আপাত সম্মতি ধরে নিয়ে পুরুষ তার ওপর নিপীড়ন চালায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে নারী উপলব্ধি করল পুরুষতন্ত্রের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। তাই এই সময় (১৬৬২) (সাহেদুল, ২০০২ : ২৮) থেকে নারীরা প্রথম পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়। নারীবাদীরা মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ নারীবাদী ধারণার জন্ম দিয়েছে।

জেন্ডার বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, জাতি বৈষম্য, পরিবেশের প্রতি বৈষম্য সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনাকে কেন্দ্র করে কিছু তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এসব তত্ত্বের মধ্যে নারীবাদ, পরিবেশবাদ ও মার্কসবাদ উল্লেখযোগ্য। (রাশিদা, ২০০৫ : ৮৪) নারীবাদ বিষয়টি সাম্প্রতিক মনে হলেও এর সূচনা ঘটেছে পরিবেশবাদের বহুপূর্বে। খ্রিষ্টপূর্ব ছয়শ শতকে পিথাগোরীয় দর্শন ও প্রাচীন যুগের দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে নারীবাদের ধারণা রয়েছে। প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'নারীদেরও পুরুষের মতো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণের সমান অধিকার থাকা উচিত। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থই প্রধান। রাষ্ট্রের ঐক্য ও শক্তির স্বার্থে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও সমান ও একই দায়িত্ব বহন করবে' (সরদার, ১৯৭৫ : ২২৫-২২৬)। প্লেটো রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, কাজটি নারী করবে না পুরুষ করবে তা বিবেচনা করেননি। যেমন, রাষ্ট্রের নাগরিকদের তিনি তিন শ্রেণিতে (উৎপাদক, সৈনিক শ্রেণি ও অভিভাবক শ্রেণি) ভাগ করে বলেছেন যে, অভিভাবক শ্রেণি নারীও হতে পারবে, তবে পুরুষের মতো সমান দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাঁর কাছে যোগ্যতাই হলো কাজের মাপকাঠি। অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে

তিনি নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে গ্রহণ করেননি বরং তারা যে কাজের দায়িত্ব পালন করবে সে কাজের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার প্রতি সততা আছে কিনা এমন বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। প্লেটো রাষ্ট্রের মঙ্গলের বিষয়টি সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন বলে প্রাচীন যুগের দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীণ সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে কাজের যে বৈষম্য ছিল তা উপেক্ষা করেছেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্লেটো যেমন নারী-পুরুষের ভেদাভেদ করেননি তেমনি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও বৈষম্য করেননি। তিনি বলেন, 'পুরুষদের জন্য আমরা যে সঙ্গীত ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেছিলাম নারীদেরও সঙ্গীতে ও শরীরচর্চায় শিক্ষিত করতে হবে এবং পুরুষদের ন্যায় তাদেরও রণকৌশল আয়ত্ত করতে হবে' (সরদার, ১৯৭৫ : ২৩১)। উদাহরণস্বরূপ প্লেটো বলেন, নারীরা সঙ্গীত ও শরীরচর্চায় কিরূপ দক্ষতা দেখাবে বা কেমন করে অস্ত্রধারণ করবে এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে অশ্বচালনা করবে — এসবের ওপর আমাদের দৃষ্টিপাত করলে চলবে না, কঠিন বিধানগুলি আমাদের প্রণয়ন করতে হবে।

তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের জন্য একই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং একই রকম সামাজিক কর্মের উল্লেখ রয়েছে। শাসক শ্রেণির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। প্লেটোর মতানুযায়ী, জৈবিক দিক থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং অধিকার ও দায়িত্ব পালনের সাথে এ পার্থক্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজের নাগরিক হিসেবে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব সমান। তাই প্লেটো বলেন, 'যে শিক্ষা একজন পুরুষকে উত্তম অভিভাবক বা শাসকে পরিণত করে সে শিক্ষা একজন নারীকেও উত্তম শাসকে পরিণত করে' (সরদার, ১৯৭৫ : ২৩৮)। প্লেটোর এ উক্তি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তিনি নারী-পুরুষ — এ বিবেচনা না করে সমাজের কল্যাণে উভয়ের দায়িত্ব সমান বিবেচনা করেছেন।

প্লেটো সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য মোচনের প্রয়াসে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, লিঙ্গগত দিক থেকে নারী ও পুরুষ ভিন্ন হলেও তাদের কার্যক্রম ভিন্ন হবে এমন দৃষ্টিভঙ্গি অযৌক্তিক। কেননা আমরা বাস্তবে লক্ষ করি মানুষে-মানুষে পার্থক্য রয়েছে — যেমন কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ মোটা, কেউ পাতলা। এ পার্থক্যের দরুন যেহেতু তাদের কাজের পার্থক্য করা হয় না সেহেতু মানুষকে নারী বা পুরুষ না ভেবে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করাই প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রাচীন যুগে যখন সমাজে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না সে সময়ে প্লেটো এমন একটি মানব সমাজ কামনা করেছিলেন যেখানে থাকবে না কোন অন্যায়-অবিচার। এ লক্ষ্যে তিনি নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করেননি। তিনি মনে করেন, সামর্থ্যের দিক থেকে প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। পুরুষ যেমন পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে, নারীও তেমনি যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ যোগ্যতা হবে কর্ম নির্ধারণের মানদণ্ড, নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্য নয়। প্লেটো যুক্তি প্রদান করে বলেন, আদর্শ রাষ্ট্রে যে শিক্ষা

ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে সে শিক্ষা ব্যবস্থা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি একজন নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিক্ষা গ্রহণের সফলতার ওপরই নির্ভর করবে কে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে আর কে করবে না। এভাবে প্লেটো নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সমতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন (রাশিদা, ২০০৫ : ২০)। প্লেটোর এ দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নারীবাদী, যদিও প্লেটো পুরুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছেন; কারণ তিনি বলেন যে, স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ এ জন্যে যে বর্বর না হয়ে সুসভ্য গ্রিক জাতির একজন হয়ে তিনি জন্মেছেন, ক্রীতদাস না হয়ে স্বাধীন হয়ে জন্মেছেন, মহিলা না হয়ে পুরুষ হয়ে জন্মেছেন। তবে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের কিছু কিছু বক্তব্যের জন্য তাকে সমালোচনা করা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়।

এতক্ষণ প্লেটোর আলোচনায় আমরা নারী-পুরুষের সমঅধিকারের ধারণা পেয়েছি। আমরা লক্ষ করি যে প্লেটো অনেক পূর্বে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে নারীর অবস্থানের গুণগত দিককে মর্যাদা দিয়েছেন। আমরা সমাজে নারী-পুরুষের মাঝে লিঙ্গভিত্তিক যে বৈষম্য এবং নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল এ ধরনের যে মনোভাব প্রত্যক্ষ করি প্লেটোর আলোচনায় তা ব্যক্ত হয়নি; বরং তিনি নারী ও পুরুষ উভয়কে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যন্ত সমান মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। প্লেটোর এই সমতাভিত্তিক উদারনৈতিক চিন্তা নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নারী-পুরুষ সম্পর্কে তাঁর সমতাভিত্তিক মতাদর্শ প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে সেই একই লক্ষ্য (সমঅধিকার) অর্জনের জন্য সোচ্চার হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থের নারীবাদ পরবর্তী চিন্তাবিদদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

প্লেটোর এই নারীবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালে নারীবাদ ও নারীবাদী চিন্তার যে উন্মেষ ঘটে তা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। যেমন — ইউরোপে সব যুগেই নারী চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও ষোড়শ শতকে সামন্তপ্রভু রাজা ও চার্চের বিপুল আধিপত্য হ্রাসের ফলে ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের অধিকার খর্ব, শিল্প বিপ্লবের শুরু, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বস্তুবাদী দর্শনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটনা সমাজে এক নতুন শ্রেণিশক্তি ও সমাজ ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটায়। এই শ্রেণিশক্তিই পরবর্তীকালে নারী অধস্তনতার ও নিপীড়নের বিরোধিতা করে এবং নারী অধিকার নিয়ে লেখালেখি করে। তবে তা নারীকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়। কেননা বিভিন্ন ধর্মান্ধ ব্যক্তি, এমনকি দার্শনিক রুশোর লেখনীতে নারী ছিল ভোগ্য সামগ্রী। কিন্তু ১৬৪৫সালে মেরিকপ, ১৬৯৭সালে মেরি স্যাস্টটল প্রমুখ চিন্তাবিদ নারীর পূর্ণ সামাজিক অধিকার প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠার জন্যে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৭৩৯ সালে জনৈক মহিলা Women are not inferior to men (ফারজানা, ২০০০ : ৫২) লেখেন যেখানে তিনি শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাম্যের কথা বলেন। কিন্তু এসব লেখালেখি ইংল্যান্ডে বিপ্লব পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তেমন অবদান রাখেনি।

ষোড়শ শতক থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চার্চের অধিপত্য, শাসকদের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও ও নিউটনের মাধ্যমে পৃথিবী, গতি, প্রকৃতির নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানুষের যে পরিচয় ঘটেছিল তা চার্চের আধিপত্য ও শাসকদের নিপীড়নমূলক মনোভাবকে দুর্বল করে দিয়েছিল। উক্ত সময়ের পূর্বে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের ক্ষমতার অবসান ঘটে, শিল্প বিপ্লব শুরু হয়; ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বস্তুবাদী দর্শনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে সমগ্র ইউরোপে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ফ্রান্সের বাস্তব পরিস্থিতি, রাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা ও সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙন, সেখানকার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ফরাসি বিপ্লবকে বেগবান করে তোলে। ফলে ১৭৮৯ সালে ফরাসি দেশে এই বিপ্লব সংগঠিত হয়। এই ফরাসি বিপ্লব শ্রমিক, কারিগর ও কৃষকদের নতুনভাবে কাজ করার প্রেরণা যোগায় এবং পুরুষের পাশাপাশি শ্রমজীবী নারীদেরও সক্রিয় করে তোলে। সামাজিক শক্তি হিসেবে নারীর আবির্ভাবও এই সময় থেকে শুরু হয়।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে মেরি উলস্টোনক্রাফট (১৭৫৯-৯৭) রক্ষণশীল সমাজের প্রতিবাদ করে এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে ১৭৯১ সালে *A Vindication of the Rights of Woman* রচনা করেন (Mary, 1992 : 02)। উলস্টোনক্রাফট উল্লেখ করেন, নারীরা সমাজে যে কেবল জৈবিক কারণে রাজনীতির শিকার তা নয়, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর ভূমিকাকে পশ্চাৎপদ করে দিচ্ছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিও করেছেন তিনি এখানে। তিনি আরও বলেন, জেন্ডার বৈষম্য সমাজে নারীর অবনত অবস্থা, নারীর আত্মমর্যাদাবোধকে বিনষ্ট করে নারীর জন্যে চরম ক্ষতিসাধন করছে। তাছাড়া তিনি শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে সম অধিকার দাবি করেন। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের সময় তাঁর দাবিগুলো গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৭৮৮ সালে উলস্টোনক্রাফট নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাস *Mary, A Fiction* প্রকাশ করেন (Mary, 1992 : 07) এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৭৯০ সালে *A Vindication of the Rights of Men* রচনা করেন (Mary, 1992 : 11)। তাঁর এই গ্রন্থগুলো নারীবাদীদের প্রেরণা যুগিয়েছে যুগে যুগে।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব (পুরুষের পাশাপাশি শ্রমজীবী নারীদেরও সক্রিয় করে তুলেছিল) সংগঠিত হওয়ার পরে সমগ্র বিশ্বের মানুষ যখন স্বীয় অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন তখন উলস্টোনক্রাফট উপলব্ধি করেন, নারী যেহেতু সমাজের একটি বড় অংশ সেহেতু নারী সমাজকে পেছনে ফেলে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি পুরুষের ন্যায় নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। মানবজাতির একটি বড় অংশ হচ্ছে নারী। আর নারী তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সমাজের দ্বৈত নীতির কারণে। সমাজে দুই ধরনের নীতি বিদ্যমান, যেমন পুরুষের জন্য উচ্চমানের নীতি (পুরুষ সবল, বীর, যোদ্ধা, পরাক্রমশালী, উচ্চ মার্গের) এবং নারীর জন্যে নিম্নমানের নীতি (নারী দুর্বল, হীন, ভীরু, আবেগপ্রবণ, কোমল, সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ)। সমাজ পুরুষের জন্য উৎকৃষ্ট

নীতি এবং নারীর জন্য নিম্নমানের নীতিকে অবলম্বন করে। উলস্টোনক্রাফট সমাজের এই দ্বৈত নীতিকে আঘাত করেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সমাজে নারী-পুরুষের জন্যে দুই রকম মূল্যবোধের কারণে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়। তাই তিনি সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধকে দূরীকরণের মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন, সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টিকারী দ্বৈত মূল্যবোধ সমাজ থেকে দূর করতে হবে।

জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-৭৩) *The Subjection of Women* (১৮৬৯) গ্রন্থটিও নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মিলের গ্রন্থটি নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক প্রকার বাইবেলস্বরূপ। এ গ্রন্থে তিনি পুরুষ শব্দের পরিবর্তে 'ব্যক্তি' কথাটি প্রথম উল্লেখ করেন। পশ্চিমা দেশগুলোতে আমরা যেসব নারী তাত্ত্বিকদের পাই তাঁরা হলেন, বেটি ফ্রিডান (১৯২১-২০০৬), এঞ্জেলা ডেভিস (জ. ১৯৪৪), শুলামিথ ফায়ারস্টোন (১৯৪৫-২০১২), কেট মিলেট (জ. ১৯৩৪), জুলিয়েট মিশেল (জ. ১৯৪০) প্রমুখ। এদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও এদের বিকাশ ঘটেছে নারী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ষোড়শ শতকে ইউরোপের নবজাগরণ এবং বিশ শতকে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইউরোপের নারী জাগরণের প্রভাব ভারতীয় সমাজেও পড়তে দেখা যায়। উনিশ শতকের শুরুতেই ভারতীয় সমাজে নারী অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় (সরদার, ১৯৮৬ : ৪০৩) কর্তৃক আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ঘটেছিল (আনু, ২০০৫ : ৩৮)। তাদের এ অগ্রসরতা নারীদের নাড়া দিয়েছিল এবং আন্দোলনে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

প্রাচ্যের নারীবাদ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যাকে বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। নারীবাদীরা রোকেয়াকে নারীর অধিকার ও মর্যাদা অর্জনের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক মনে করেন। কেননা প্রাচ্যের মুসলিম সমাজের নারীরা যখন ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল তখন তিনি সমগ্র বাঙালি নারী জাগরণের লক্ষ্যে তাঁর লেখনীর ধারা অব্যাহত রেখেছেন। রোকেয়া *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*, *তারিনী-ভবন*, *মতিচুর* প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজের সর্বস্তরে যে কুসংস্কার ও ধর্মের নামে যে অনাচার চলছিল তার বিরুদ্ধে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মুক্তবুদ্ধির। তাঁর মতে, বুদ্ধি যেখানে নিষ্প্রভ সেখানেই অন্যায়, অবিচার, অসভ্যতা এবং বর্বরতা দেখা যায়। আর বুদ্ধি যেখানে মুক্ত ও শানিত সেখানে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সমাজে নারী পুরুষ মিলে-মিশে একই পথে অগ্রসর হবে সেই সমাজে জ্ঞানের আলো অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূরীভূত করবে এবং সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক আদর্শ সমাজ গঠনে সমর্থ হবে।

রোকেয়ার মতে, সমাজের সর্বস্তরে নারী অনগ্রসর অবস্থায় রয়েছে। এ অনগ্রসরতার জন্য তিনি পিতৃতন্ত্রকে দায়ী করেন। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ছিলেন পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে। কিন্তু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি পুরুষের সহযোগিতা আশা করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিটি গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, পুরুষশাসিত সমাজই নারীর অধিকার হরণ করেছে। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ জৈবিক কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে অধস্তনতা তৈরি করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধস্তনতা জৈবিক নয় বরং সমাজসৃষ্ট। সমাজই নারীকে বঞ্চিত, অবমূল্যায়িত ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে।

রোকেয়ার জীবৎকালে (১৮৮০-১৯৩২) সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজ নারীর জন্য ছিল অন্ধকারময় ও কুসংস্কারাছন্ন। কেননা ভারতীয় মুসলিম সমাজ তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। মুসলিমরা ব্রিটিশদের অসহযোগিতা করার ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায় — যা সমাজব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে এবং সমাজে নারীদের অবস্থা শোচনীয় হয়। এমনই এক সময় রোকেয়া মুসলিম নারী মুক্তি ও শিক্ষার গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরেন।

প্রাচ্যের নারীবাদ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে রোকেয়াই এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনিই প্রথম মুসলিম নারী যিনি নারী ও পুরুষের সমতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তিনি নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক সচ্ছলতার মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে নারীমুক্তির কথা বলেছেন। তাঁর জীবৎকালে সমাজ ছিল অবরোধ প্রথা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন — যা মুসলিম নারীর জন্য শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক ছিল না। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। কিন্তু তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, সংস্কারমুক্ত ও উদার মনের। যার ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানপিপাসু রোকেয়া ইংরেজিতে *Sultana's Dream, পদ্মরাগ* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য তিনিই প্রথম ১৯১১ সালে কলকাতায় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (সোনিয়া, ১৯৯৭ : ১১) যার জন্য তাঁকে বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন, নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধা। কেননা মানব সমাজের অর্ধাংশ নারী সমাজ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারী সমাজের উন্নয়নের মাধ্যমে সমগ্র মানব সমাজের উন্নয়ন। যে সমাজ সভ্যতার অগ্রগতি কামনা করছে অথচ মানব জাতির অর্ধাংশ নারীকে বিভিন্ন কৌশলে (যেমন দ্বৈত মূল্যবোধ, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা) পেছনে ফেলে রাখে সে সমাজ অগ্রগতির পরিবর্তে ক্রমশই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। নারীকে অধিকাংশ সমাজ 'ব্যক্তি' মনে না করে দ্বিতীয় সত্তা, পুরুষের কাজের সহায়ক এমনকি পুরুষের দাসীরূপ মনে করে। নারীকে পুরুষের দাসী মনে করার পেছনে অযৌক্তিকতাটিকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টায় তিনি একটি চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন :

> স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশত: নারী জাতি অপর জাতির সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারেনা। কারণ, জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন-না-কোনপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে। একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। কেহ সূত্রধর কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থী আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে "স্বামী" ভাবিবেন কেন? (রোকেয়া, ১৯৭৩ : ৪৩)

নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একে অপরকে "স্বামী" বা "দাসী" মনে করা বা হীনমন্যতার ধারণা পোষণ করা যে অযৌক্তিক তা রোকেয়ার এই রচনায় আমরা দেখি। মহীয়সী নারী রোকেয়া মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রদূত, সমাজসংস্কারক, বলিষ্ঠ লেখিকা। তাঁর লেখনী দ্বারা তিনি নারীর জীবন অবক্ষয়কারী অবরোধ প্রথা ও ধর্মান্ধতাকে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিবাদী লেখনী ও বাস্তবমুখী কর্মতৎপরতা তাঁর নারীবাদী চিন্তাকে পরিস্ফুট করে।

রোকেয়ার পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রচলন ও বঙ্কিমচন্দ্র নারী-পুরুষের মধ্যে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীমুক্তির কথা বলেছেন। তবে রোকেয়া সমাজের ধর্মান্ধতা ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন, পুরুষপ্রধান সমাজ কাঠামোতে কলম ধরেছেন সেজন্য তিনি নারীবাদী চেতনার ধারক ও বাহক। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর সকল প্রবন্ধ ও উপন্যাস হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সমাজে আমরা নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষ করি তা পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট, প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। এজন্যই অনেকে তাঁর চেতনার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে। কিন্তু তাঁকে যদি আমরা যুক্তির আলোকে বিচার করি তাহলে দেখা যায় যে, তিনি নারী সমাজকে অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে আনার জন্য পুরুষপ্রধান সমাজ কাঠামোকে আঘাত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারী সমাজের উন্নয়ন। এজন্য তিনি নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। কেননা নারীরা শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর ছিল বলেই তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না। রোকেয়া নারীর বিভিন্ন অধিকার বিশেষ করে শিক্ষার উপর জোর দিয়ে নারীদের মনে স্থান করে নিয়েছেন।

রোকেয়ার মতো সকল নারীবাদী মত প্রকাশ করেন যে, সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য, অসমতা, শোষণ ও নিপীড়নের মূলে রয়েছে পিতৃতন্ত্র। নারীবাদীরা তাই পিতৃতন্ত্রের তৈরি সমাজ কাঠামো ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে।

রোকেয়া যেমন নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তেমনি আধুনিক নারীবাদের অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সিঁমো দ্য বুভোয়া (১৯০৮-৮৬) নারী সচেতনতার ('self' এবং 'others' সম্পর্কে) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেছেন। তাঁর *The Second Sex* (১৯৪৯) গ্রন্থটি নারীবাদের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

মেরি উলস্টোনক্রাফট, জন স্টুয়ার্ট মিল, বেগম রোকেয়া, সিমো দ্য বুভোয়া প্রমুখ নারীবাদীদের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীবাদীরা আজ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে, সাহসী হবার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হচ্ছে এবং আন্দোলন করছে। নারীবাদী আন্দোলনের শুরু থেকেই এ বিষয়টি উল্লেখিত হচ্ছে যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীকে সমাজে অবনত করে রেখেছে। পুরুষতন্ত্র নারীকে সমাজে অবনত করে রাখার জন্য দুই ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে। এই দ্বৈত মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজে এটাই প্রচলিত যে, নারী দুর্বল ও হীন বলে পুরুষের অধীন এবং নারী নিজেও পুরুষের সাথে নিজেকে তুলনা করে একজন অধস্তন ও অমর্যাদাবান মানুষ হিসেবে। তাই আত্মসম্মানের পরিবর্তে নারীর মধ্যে জন্ম নেয় হতাশা, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজে নারী উচ্চাসনে যেতে পারে না বরং পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। এজন্য প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই দায়ী। নারীবাদীরা মনে করেন, বৃহত্তর নারী সমাজকে অধীন রাখার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সুকৌশলে নারীকে আত্মসম্মান বোধ গড়তে বাধা দেয়। আত্ম-সম্মানের অভাব থাকলে যে কোনো মানুষ পরনির্ভরশীল হয়ে সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়, অপরদিকে অধিকার বঞ্চিত হয়ে বসবাস করে, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নারীকে আত্মসম্মানের অধিকারী হতে হবে। কেননা আত্মসম্মান নারীকে শক্তিশালী ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। নারী আত্ম-নির্ভরশীল না হয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠুক পুরুষতন্ত্র এটাই কামনা করে। এর পেছনে তাদের (পুরুষতন্ত্রের) উদ্দেশ্য হলো সর্বদা নারীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা।

নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের এই কৌশলটি (প্রভুত্ব বিস্তার) উপলব্ধি করে শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন নারীবাদীরা (যেমন, মেরী উলস্টোনক্রাফট, রোকেয়া প্রমুখ) তাই নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। 'শিক্ষা' মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ, অধিকার-কর্তব্যের বোধ, সচেতনতা বোধ, স্বাধীনতা বোধ ও আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলে। নারীর মধ্যে যেন এই বোধগুলো গড়ে না ওঠে সেজন্য পুরুষতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে নারীকে শিক্ষার সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বর্তমান যুগেও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের রক্ষণশীল পরিবারগুলো নারীকে পদানত করে রাখার জন্য শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। শিক্ষিত নারী পরিবার থেকে সমাজের সকল স্তরে (যেমন- রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) ব্যাপক অবদান রাখতে পারে — এ বিষয়টি পুরুষতন্ত্র বিবেচনা করেনি। সুযোগের অভাবে নারী এতকাল গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ ছিল। আধুনিক যুগে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নারীরা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক (যেমন— কল-কারখানাসহ পোশাক শিল্প, কৃষি কাজ, কুটির শিল্প প্রভৃতি) কাজে অংশগ্রহণ করে প্রমাণ করেছে যে, নারী পুরুষের ন্যায় সকল কাজে অভিজ্ঞ। এ বিষয়টি পুরুষতন্ত্রের চিন্তা-ভাবনায় আসেনি কেননা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ। তাদের ভাবনায় এটাই কাজ করে যে, সমাজের প্রগতিশীল কাজকর্মগুলো পুরুষ করবে আর নারী গৃহাভ্যন্তরের কাজ-কর্ম ও সন্তান লালন-পালন করবে। এ ভাবনা থেকেই পুরুষতন্ত্র সমাজে শ্রমের বিভাজন করেছে।

পুরুষতন্ত্রের ছক অনুসারে শ্রম বিভাজন করা হয় এভাবে : নারীর কর্ম প্রাইভেট (গৃহাভ্যন্তরে) পর্যায়ে এবং পুরুষের কর্ম পাবলিক (বহির্জগতে) পরিসরে। নারীর গৃহকর্মকে অনুৎপাদনশীল এবং পুরুষের বহির্জগতের কাজকে উৎপাদনমূলক হিসেবে ধরা হয়। নারীবাদীরা এই শ্রম বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সমাজের এই শ্রম বিভাজন, দ্বৈত মূল্যবোধ নারীমুক্তির অন্তরায়। নারীমুক্তির ক্ষেত্রে আত্মসম্মান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধারণা থেকে ফার্গুসন প্রস্তাব করেন যে, নারীবাদ শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারীকে তার যোগ্যতা, মর্যাদা, মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারে এবং পরিণতিতে ঐ শিক্ষা নারীকে আত্মসম্মানে উজ্জীবিত করতে পারে (রাশিদা, ২০০৫ : ৫৪)।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের তৈরি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কৌশলে নারীকে অধস্তন করে রাখার জন্য আত্মসম্মান গড়ে তোলার সুযোগগুলোকে নষ্ট করে দেয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতাসহ আত্মনির্ভরশীলতা ও মর্যাদাবোধের স্ফুরণ ঘটায়। এ গভীর সত্য উপলব্ধি করে নারী এখন শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই নারী শিক্ষার হার আধুনিক যুগে বেড়েই চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতিকে পুরুষতন্ত্র নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে। পুরুষতন্ত্র প্রচারণা চালায় নারী যতই শিক্ষিত হচ্ছে ততই পরিবারবিমুখ হচ্ছে। প্রচারণা অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে অধিক ফলপ্রসূ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত নারীর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় বলে শিক্ষিত নারী নির্বিচারে পুরুষের নিপীড়ন, শোষণ ও বৈষম্যের বেড়াজালে নিজেকে বন্দি রাখতে চায় না। আত্মসম্মান নিয়ে সমাজে নারীকে বেঁচে থাকতে হলে তাই নিজেকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতরূপে গড়ে তুলতে হবে। ফার্গুসনের উপর্যুক্ত প্রস্তাবের পক্ষে নারীবাদী সংগঠনগুলো নিজেদের ঐ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে সংহতি প্রকাশ করে এবং নারীবাদের সমর্থক অন্য প্রগতিশীল সংগঠনগুলোও এ কর্মসূচিকে বর্তমানে স্ফীত করেছে বলা যেতে পারে (রাশিদা, ২০০৫ : ৫৪)।

সমাজের প্রচলিত ধারণা হলো, নারীর ভূমিকা হচ্ছে স্ত্রী বা মায়ের ভূমিকা অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনে অধস্তনের ভূমিকা, অপরদিকে পুরুষের ভূমিকা হচ্ছে কর্তা ও শাসকের ভূমিকা। নারী যেখানে গার্হস্থ্য জীবনে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে পুরুষ সেখানে প্রতিবিধানকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে (রাশিদা, ২০০৫ : ৫৬)। নারীসমাজ পুরুষতন্ত্রের এমন শ্রম বিভাজন মেনে নিয়েছে বহুকাল ধরে। ফলে নারীর স্বাধীন সত্তার দিকটি বিকশিত হয়নি। স্বাধীনতা মানুষের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটায়, নারীর মেধার বিকাশ ঘটাতে হলে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, নারীকে 'ব্যক্তি' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। 'ব্যক্তি' বলতে নারী পুরুষ উভয়কে বুঝায়। আমরা জানি ব্যক্তি হচ্ছে আত্মসম্মানের অধিকারী সত্তা এবং এ সত্তা নৈতিক ও সচেতন সত্তা। আর নৈতিকতা সম্বন্ধে সচেতন সত্তা মাত্রই স্বাধীন সত্তা। ব্যক্তি বলতে এক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। সমাজে নারী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি ('অপর' বা 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', আবেগপ্রবণ, নিম্নমানের, সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ) বিরাজমান, সে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। কেননা নারীও ব্যক্তি, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অবাধ বিচরণের, কথা বলার ও কাজ করার অধিকার আছে। নারীবাদ উপর্যুক্ত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করে।

নারী ও পুরষের জৈবিক পার্থক্যকে পুঁজি করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ জেন্ডার পার্থক্য রচনা করে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে ও নারীকে অধস্তন করে রেখেছে — পুরুষতন্ত্রের এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ ও এ সম্বন্ধে বিভিন্ন নারীবাদী তাত্ত্বিকের ইতিবাচক চিন্তাধারা সম্বন্ধে উপরে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচনার শুরুতে পিথাগোরীয় দর্শন ও প্লেটোর দর্শনে নারী-পুরুষের মধ্যে যে সমঅধিকারের ধারণা ও নারীবাদ সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় সে-সম্পর্কে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজে নারী-পুরুষের মাঝে যে বৈষম্য লক্ষণীয় তার মূলে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বৈত মূল্যবোধ, এ বিষয়টি সম্পর্কে সকল নারীবাদীই একমত। এই দ্বৈত মূল্যবোধের কারণেই নারী সমাজে নিপীড়িত হয়ে আসছে। নারীবাদের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে সপ্তদশ শতকের ষাট-এর দশক থেকে নতুন যে চিন্তাভাবনা (অর্থাৎ নারী আন্দোলন, নারীশিক্ষা, নারী সচেতনতা) শুরু হয়েছে তার গুরুত্বও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধ দিয়ে। ওর অবসান না ঘটলে নারীমুক্তি সম্ভব নয়। নারীবাদী তাত্ত্বিকদের নারী অধিকার সম্পর্কিত মতাদর্শ ব্যাখ্যা করে আমরা এটাই বুঝেছি যে, পুরুষের ন্যায় নারীও 'ব্যক্তি', তার আত্মসম্মানবোধ আছে, শিক্ষার মাধ্যমে নারী তার মর্যাদাবোধের স্ফুরণ ঘটাতে পারে। নারীবাদীদের উপর্যুক্ত মতাদর্শ নারীমুক্তির ক্ষেত্রে সহায়ক।

গ্রন্থপঞ্জি

আনু মুহাম্মদ (২০০৫)। *নারী পুরুষ ও সমাজ*, সন্দেশ, ঢাকা।

ফারজানা নাজ (২০০৯)। *জেন্ডার শব্দকোষ*, এ.এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

ফারজানা সুলতানা (২০০০)। "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীবাদী দর্শন : মেরি উলস্টোনক্রাফট ও বেগম রোকেয়া", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, নং-৭৭।

মাহমুদা ইসলাম (২০০৮)। *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

মোবারক ও অন্যান্য (২০০২)। "বেগম রোকেয়ার নারীবাদী চিন্তাধারা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" *ক্ষমতায়ন*, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, সংখ্যা-৪।

রাশিদা আখতার খানম (২০০৫)। *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সাহিত্যিকা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৯৭৩)। "অর্ধাঙ্গী", *রোকেয়া রচনাবলী*, কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সরদার ফজলুল করিম অনূদিত (১৯৭৫)। *প্লেটোর রিপাবলিক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সরদার ফজলুল করিম (১৯৮৬)। *দর্শনকোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সাহেদুল আকবর খান (২০০২)। "নারীবাদ : সামাজিক প্রেক্ষিত", *ক্ষমতায়ন*, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা।

হামিদা আখতার বেগম (২০০০)। 'গ্রন্থ আলোচনা', *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, সংখ্যা-৭৭।

Mary Wollstonecraft (1992). *A Vindication of the Rights of Woman,* Penguin Books, Reprinted with a revised introduction chapter, England.